সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ

শামসুদ্দিন আহমদ*

ভূমিকা

সত্যকে বের করাই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। তা যেমনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (Physical science) বেলায় প্রযোজ্য তেমনি সামাজিক বিজ্ঞানের (social science) বেলায়ও প্রযোজ্য। সামাজিক বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুসন্ধান চালানোকে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা (Social Science Research) বলা যেতে পারে। পি ভি ইয়ং (P. V. Young) এর মতে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা হল একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যার মাধ্যমে যুক্তি ভিত্তিক (logical) প্রণালীবদ্ধ (systematic) পদ্ধতি (technique)–এর ভিত্তিতে (ক) নতুন তথ্য আবিষ্কার করা হয় অথবা পুরানো তথ্যকে যাচাই করা হয়, অথবা (খ) নতুন গবেষণা পদ্ধতি (tools), বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নির্ভরযোগ্য যুক্তিসিদ্ধ (valid) অনুসন্ধানের মাধ্যমে মানুষের আচরণের স্বরূপ ও কার্যকারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়, অথবা (গ) তথ্যের পর্যায়ক্রম (sequence) বের করে এক তথ্যের সাথে ভিন্নভাবে লব্ধ অপর একটা তথ্যের সম্পর্কের আবিষ্কার ও তাদের মধ্যেকার কার্যকারণ সম্পর্কের উপর যথার্থ তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়।[১] সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণায় সত্যকে আবিষ্কার করতে যেয়ে মানুষের আচার–ব্যবহারের অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক নিয়মকে বা মূল তত্ত্বকে উদঘাটন করা সম্ভব হতে পারে অথবা দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হয় তার সমাধান পাওয়া যেতে পারে। তাই সেলটিজ ও তার সংগী গবেষকগণ বলেছেন, কোন গবেষণা প্রচেষ্টা কোন বাস্তব সমস্যা বা প্রশ্নের প্রয়োজনে তথ্যের উদ্‌ঘাটন করতে যেয়ে যেমন মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করে থাকে, তেমনি মূল তত্ত্ব ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধানও সম্ভব হতে পারে। [২]

---

* *অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

সামাজিক বিজ্ঞান মানুষের ব্যবহার বা আচরণ ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। তাই মানুষের আচরণকে বুঝতে হলে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের সম্পর্ক বুঝতে হলে সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

সমাজের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হলে নতুন জ্ঞান বা নতুন তথ্য আহরণ করা দরকার; কারণ প্রগতিশীল বিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পুরাতন তথ্য ও সিদ্ধান্তকে অবিরামভাবে তলিয়ে (verify) দেখা। সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা ছাড়া পুরাতন তত্ত্বকে তলিয়ে দেখা যাবে না এবং মানব সমাজের বিভিন্ন সমস্যা বুঝতে পারাও অসম্ভব।

মানুষের সামাজিক জীবন ও সামজিক ব্যবহারে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হলে তাদের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে। আর সমস্যার কারণ জানতে হলে মানুষের সমাজ ও তা কিভাবে কাজ করে এসব বিষয় পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হবে এবং তা বুঝতে হলে সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

একজন লোকের ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে কিছু বলা দুষ্কর যদিও কোন গোষ্ঠী বা দেশের লোকের আচরণ সম্পর্কে কোন কিছু বলা ততটা কঠিন নয়। সামাজিক চলক (variable) সম্পর্কে জ্ঞান যতবেশী হবে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে আরও অধিকতর সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব হবে। আর সামাজিক চলক সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভ করতে হলে সামাজিক গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। সামাজিক চলকের গতিধারা সম্পর্কে যতবেশী জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ও সমাজ উন্নয়নের পরিকল্পনা তত সহজ হবে।

সামাজিক ঘটনাগুলোর (phenomena) মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে; আর এ কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝতে হলে, জানতে হলে তা কোন প্রচেষ্টা ছাড়া জানা যাবে না; তার জন্য দরকার সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা, যা কার্যকারণ সম্পর্ক জানার একটি প্রচেষ্টা।

স্বল্পতম সময়ে সামাজিক বিজ্ঞানে নতুন তত্ত্ব, ধারণা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য। আর এ সকল তত্ত্ব, ধারণা ও পদ্ধতি আবিষ্কার করা সম্ভব নয় সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা ব্যতীত।

অজানাকে জানার ও আবৃত সত্যকে অনাবৃত করার অদম্য স্পৃহা মানুষের। আর সামাজিক বিষয়ে অজানাকে জানার ও আবৃত সত্যকে অনাবৃত করার উপায় হল সমাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা।

সমাজের গতিশীলতা বুঝতে হলে, সামাজিক বিষয়ের অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন যা সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণা ব্যতীত সম্ভব নয়।

সমাজের উন্নতির জন্য সামাজিক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রয়োজন। কিন্তু এসব পরিকল্পনার জন্য দরকার নির্ভরযোগ্য তথ্যভিত্তিক জ্ঞান যার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সেসব অসুবিধা এড়ানোর জন্য বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়; পরিকল্পনায় সমাজের কতটুকু লাভ হবে তা মূল্যায়ন করা হয়।

জ্ঞানই শক্তি। সমাজ কিভাবে কাজ করে, এর প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে কাজ করে এবং একটা অপরটার সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত, তা জানা থাকলে সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করা ও সমাজের সংস্কার সাধন করা সহজ হয়; সমাজে সঠিক নেতৃত্ব তৈরী করা সম্ভব হয়। আর সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেই তা করা সম্ভব।

সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃনির্ভরশীলতা (interdependence) রয়েছে। সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করে তাদের মধ্যে সমঝোতা (understanding) বাড়াতে হবে। আর তা করা যায় তথ্য ভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে। এবং তথ্য–ভিত্তিক জ্ঞান পাওয়া সম্ভব সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার মাধ্যমে।

গবেষণার প্রকারভেদ
(Types of Research)

সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি (methods) আছে; গবেষণার পদ্ধতি অনুযায়ী গবেষণার নামকরণ করা হয়। পদ্ধতি অনুযায়ী সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণাকে নিম্নে বর্ণিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ অনুসন্ধানমূলক গবেষণা; বর্ণনামূলক গবেষণা; জরিপ গবেষণা; নিবিড় সাক্ষাতকার গবেষণা; পর্যবেক্ষণ মূলক গবেষণা; পরীক্ষামূলক গবেষণা; ঐতিহাসিক বিশ্লেষণমূলক গবেষণা; বিষয়বস্তু বিশ্লেষণমূলক গবেষণা; সমষ্টিক উপাত্ত বিশ্লেষণমূলক গবেষণা; তুলনামূলক গবেষণা; মূল্যায়ন গবেষণা ও এ্যাকশন গবেষণা।

নিম্নে এ সকল গবেষণা কোন অবস্থায়, কি উদ্দেশ্যে, কিভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং এ সকল গবেষণার কি কি সীমাবদ্ধতা আছে – এ সকল বিষয় উদাহরণ সহকারে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

অনুসন্ধানমূলক গবেষণা
(Exploratory Research)

অনুসন্ধামূলক গবেষণায় কোন বিষয়বস্তু বা সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা হয় বা এগুলো সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকপাত করা হয় যাতে কোন গবেষণার বিষয়বস্তু বা সমস্যাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় বা কোন অনুমান (hypothesis) গঠন করা

যায়। যে বিষয়ে/সমস্যা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে/সমস্যা সম্বন্ধে কিছু জানতে পারাই এ রকম গবেষণার প্রধান লক্ষ্য। এ রকম ক্ষেত্রে গবেষণার নকসা বা রূপরেখা (design) যথার্থ নমনীয় (flexible) হয়ে থাকে যাতে করে গবেষণনার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক গবেষণার আওতায় আনা যায়। এ ধরনের গবেষণায় নিম্নলিখিতপদ্ধতিগুলো[৩] অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা (Review of relevant literature)

(খ) অভিজ্ঞতার জরিপ (Experience survey)

(গ) লক্ষ্য গ্রুপ জরিপ (Focus group survey)

(ঘ) কেইস স্টাডি (Case study)

গ্রন্থ পর্যালোচনা ঃ যে বিষয়বস্তুর উপর গবেষণা করা হবে সে বিষয়বস্তুর উপর যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বা কাজ হয়েছে গবেষককে সেগুলো ভালভাবে পড়তে হবে যাতে সে জানতে পারে, বিষয়বস্তুর উপর কি কি গবেষণা হয়েছে, কিভাবে গবেষণা করা হয়েছে এবং কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। ফলে গবেষক বুঝতে পারবে বিষয়বস্তুর উপর কতটুকু কাজ হয়েছে এবং তাকে কি কাজ করতে হবে এবং কতটুকু করতে হবে।

অভিজ্ঞতার জরিপ ঃ গবেষক যে বিষয়বস্তুর উপর গবেষণা করতে যাচ্ছেন, সে বিষয়বস্তুর উপর যারা গবেষণা করেছেন অথবা যাদের সে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল বলে মনে হয় তাদের একটা তালিকা তৈরী করে একে একে সবার সাথে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে গবেষক আলাপ করে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। তবে এরূপ আলোচনার পূর্বে গবেষককে বিষয়বস্তু বা সমস্যাটি সম্পর্কে কি জিজ্ঞাসা করতে হবে, কিভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে, – এসব ব্যাপারে মোটামোটি ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। এরূপ আলাপের সময় কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে তার একটা তালিকা গবেষকের কাছে থাকলে ভাল।

লক্ষ্য গ্রুপ জরিপ ঃ যে বিষয়বস্তু বা সমস্যার উপর যে সকল ব্যক্তিবর্গের উপর গবেষণা চালানো হবে তাদেরকে "লক্ষ্য গ্রুপ" বলা হয়। লক্ষ্য গ্রুপ সম্পর্কে গবেষকের নিজের কোন ধারণা না থাকলে গবেষক বিষয়বস্তু বা সমস্যার উপর লক্ষ্য গ্রুপের লোকজনদের সাথে আলাপ করতে পারেন। এরূপ আলোচনায় কি কি বিষয়ে আলাপ করা হবে তার একটা তালিকা গবেষক প্রস্তুত করবেন। লক্ষ্য গ্রুপের সাথে আলোচনার সময় গবেষক শুধুমাত্র আলোচনা আরম্ভ করবেন, পরিচালনা করবেন এবং লক্ষ্যগ্রুপের লোকজন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর যা বলে তা রেকর্ড করে রাখবেন। এভাবে নির্দিষ্ট গবেষণার বিষয়বস্তুর উপর গবেষকের পক্ষে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে।

কেস স্টাডি ঃ এক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়ের উপর গবেষক যাদের সম্পর্কে গবেষণা করবেন তাদের কয়েকজনের সাথে নিবিড়ভাবে কথোপকথন করবেন। কথোপকথনের মাধ্যমে গবেষক জানতে চান, এরূপ আচরণের কারণ কি কি? যেমন মানসিক হাসপাতালের রোগীকে প্রশ্ন করে কথোপকথনের মাধ্যমে ডাক্তার উদঘাটন করতে চান কি কি কারণে রোগী মানসিকভাবে ব্যধিগ্রস্ত হয়েছে। তবে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করলে সাক্ষাতকার প্রদানকারীর মেজাজ নষ্ট হতে পারে অথবা সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে সে সব কথা একটু ঘুরিয়ে বলাই বাঞ্ছনীয়।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে অনুসন্ধানমূলক গবেষণায় গবেষক গবেষণার বিষয়বস্তু/সমস্যা সম্পর্কে বেশ জ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং অনুমান গঠন করতে পারেন। মনে রাখা উচিৎ এ ধরনের গবেষণায় গবেষক অনুমান যাচাই করেন না বরং অনুমান গঠন করাই তার কাজ। একটি উদাহরণের সাহায্যে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা কি, তা বুঝানো যেতে পারে। শিশু মৃত্যু হারের সাথে গর্ভধারণের উচ্চ হারের সম্পর্ক দেখা যায়। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্রমশ বুঝতে পারছে যে শিশু মৃত্যু হার কমাতে না পারলে সন্তান জন্মের হার বাড়তেই থাকবে। ফলশ্রুতিতে উন্নত দেশের মত এ সকল দেশ শিশু যত্নের দিকে অধিকতর নজর দিচ্ছে। তেমনিভাবে বাংলাদেশ মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে। এ ব্যবস্থায় সরকার প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে বা করছে। এ কেন্দ্রের সেবার পরিমাণ বা ধরণ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, বর্তমানে গর্ভবতী মায়েরাও এ সব কেন্দ্রের সুযোগ যথার্থ পরিমাণে ব্যবহার করছেন না। স্বভাবতই দেশের নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণের প্রশ্নঃ কেন এ কেন্দ্রগুলো গর্ভবতী মায়েদের সেবা কেন্দ্র হিসাবে যথাযথ ব্যবহৃত হচ্ছে না?

একজন গবেষক এ প্রশ্নের জবাব জানেন না। তাই গবেষক কিছু প্রশ্ন তৈরী করবেন এবং উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোর এক বা একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করবেন। তখন তিনি জানতে পারবেন কেন গর্ভবতী মায়েরা সেবা কেন্দ্রগুলো ঠিকমত ব্যবহার করছেন না। তখন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর যথার্থ ব্যবহার হওয়া বা না হওয়ার কারণ সম্পর্কে অনুমান (hypothesis) তৈরী করা গবেষকের পক্ষে সম্ভব হবে।

বর্ণনামূলক গবেষণা
(Descriptive Research)

বর্ণনামূলক গবেষণায় গবেষণার বিষয়বস্তু বা সমস্যা সম্পর্কে গবেষকের কিছুটা ধারণা থাকে। এ গবেষণার মাধ্যমে কোন জনপদ বা গোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়। এতে উক্ত জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের ধারা, প্রকৃতি, পরিবেশ

ও পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জনমিতিক অবস্থা ও তাদের চিন্তাধারা বা ভাবনা সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। অথবা তাদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন কেমন করে, কত দ্রুত হচ্ছে সে সম্পর্কে জানা যায়। এক্ষেত্রে গবেষণার পরিকল্পনা বা নকসা অনমনীয় (rigid) হয়ে থাকে। এ ধরনের গবেষণায় বর্তমানে বিভিন্ন জনের (cross-section) কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়; সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে সর্বজনীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতএব, এ জাতীয় গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে উপাত্ত সংগ্রহ এবং কার্যকারণ সম্পর্ক বের করার জন্য তথ্য বিশ্লেষণ।[8] সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার পর্যায়ভুক্ত নিয়মগুলো যেমন গবেষণার উদ্দেশ্য, অনুমান গঠন বা নমুনায়ন, তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহকারী নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্য বিশ্লেষণ বর্ণনামূলক গবেষণায়ও প্রযোজ্য। এ জাতীয় গবেষণার একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন মা ও শিশুর সেবা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক সৃষ্ট ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলো। এ উদারহরণ সামনে রেখে বর্ণনামূলক গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উপস্থাপন করা যেতে পারেঃ

যারা কেন্দ্র থেকে সেবা পাবেন বা পাচ্ছেন তাদের বয়স কত?

লেখাপড়া জানেন কি?

কোন চাকুরী করেন কি?

জীবিত ছেলে মেয়ে কয়জন?

পরিবারের মাসিক আয় কত?

আবাদযোগ্য জমি আছে কি না, থাকলে কতটুকু? ইত্যাদি।

এসব প্রশ্নের উপর তথ্য সংগ্রহ করে গবেষক বর্ণনায় বলতে পারবেন কেন্দ্রগুলো থেকে যে সব মহিলা সেবা পেয়েছেন তাদের আর্থ–সামাজিক–জনমিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি।

বর্ণনামূলক গবেণণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর দৃষ্টি রাখতে হবেঃ যে বিষয়বস্তু সমস্যার উপর গবেষণা করা হচ্ছে সে বিষয়বস্তু সমস্যার উপর সঠিক ও পর্যাপ্ত গ্রন্থের পর্যালোচনা করা (খ) তথ্য সংগ্রহের ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করা (গ) গবেষণার বিষয়বস্তুর সমস্যার সাথে সম্পর্কিত যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিন্তু গবেষক কোন সুরাহা করতে পারে নাই সে সব সমস্যার তালিকা প্রদান করা।

যে কোন গবেষণায় বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না। যে সব গবেষণায় তা ব্যবহার করা যায় তা হল, প্রথমতঃ গবেষণার বিষয়বস্তু/সমস্যা বর্ণনা করার উপযোগী হতে হবে; যেমন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানমূহের (আই· এম· এফ· ও বিশ্ব ব্যাংক) উদ্দেশ্য, কাঠামো, সফলতা, বিফলতা প্রভৃতি বর্ণনা করা সম্ভব বলে এসব ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে হেরাল্ড–

ডমার মডেল বা ইনপুট–আউটপুট মডেলের কোনটি বাংলাদেশের পরিকল্পনার জন্য শ্রেয় তা বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতির দ্বারা বের করা সম্ভব নয় কারণ অর্থনৈতিক যুক্তি–তর্কের মাধ্যমেই তা স্থির করা হয় এবং সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ যে তথ্য সংগ্রহ করা হবে তা সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ, ও সম্ভব হলে পরিমানসূচক (quantifiable) হতে হবে; অন্যথায় গবেষণার বিষয়বস্তু/সমস্যার উপর তথ্য সংগ্রহে অসুবিধা হতে পারে।

বর্ণনামূলক গবেষণার প্রথম সীমাবদ্ধতা হল, ইহা শুধু গবেষণার বিষয়বস্তু/সমস্যার বর্তমান অবস্থা নিয়েই আলোচনা করে, অতীতে সমস্যাটি কি ছিল বা ভবিষ্যতে কিরূপ নেবে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না ফলে ইহা সমস্যাটি নিয়ে পুরোপুরিভাবে আলোচনা করে না। দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হল, এ ধরনের গবেষণায় খুব বেশী পরিমাণে পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়; খুব বেশী পরিসংখ্যান ব্যবহার করলে কার্যকারণ–সম্পর্ক বের করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

জরিপ গবেষণা
(Survey Research)

সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার সর্বাপেক্ষা সাধারণ ধরণ হল জরিপ। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক বিজ্ঞানে যে সব বিষয়ে গবেষণা হয়ে থাকে তা জরিপের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। জরিপের মাধ্যমে একটি গোষ্ঠীর বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগি, মূল্যাবোধ ও আচরণের বর্ণনা দিতে এবং ব্যাখ্যা করতে যে সব তথ্যের প্রয়োজন তা জরিপের মাধ্যমেই সংগ্রহ করা হয়।

জরিপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমষ্টি থেকে কোন এক অংশের নির্বাচন যা সেই সমষ্টিকে প্রতিনিধিত্ব করে। খুব সহজ উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মানুষের শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত মানুষের শরীরের সমগ্র রক্তের প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে এক ফোঁটা রক্ত দিয়েই মানুষের শরীরের সমস্ত রক্ত সম্বন্ধে বিশেষ ব্যপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কারণ একজন মানুষের শরীরের রক্ত এমনভাবে সমজাতীয় (homogeneous) যে শরীরের যে কোন অঙ্গ থেকে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করলে যে সব গুণাগুণ পাওয়া যাবে তাতে শরীরের সমস্ত রক্তের গুণাগুণ প্রতিফলিত হবে। কিন্তু যখন কোন সমষ্টি যে সকল এককের সমন্বয়ে গঠিত সে সকল এককগুলো অসমজাতীয় হয় তখন এত সহজে সমষ্টিকে প্রতিনিধিত্ব করার মত এককগুলো নির্বাচন করা যায় না। ধরা যাক, বাংলাদেশ সুরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পোলিও এবং হামের প্রতিষোধক টীকা নিয়েছে এমন সব শিশুর আনুপাতিক হার জানতে আমরা আগ্রহী অর্থাৎ বাংলাদেশের শিশুর শতকরা কত অংশ পোলিও এবং হামের টীকা নিয়েছে তা জানতে আগ্রহী। এখানে শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকার শিশুরা কি বাংলাদেশের জন্য প্রতিনিধিত্ব করতে পারে? কিংবা কোন একটি গ্রামের শিশুরা কি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে? উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক। কারণ পোলিও ও হামের প্রতিষেধক টীকা গ্রহণকারী শিশুরা বাংলাদেশে সমভাবে ছড়িয়ে নেই এমন ভাবার যথেষ্ট অবকাশ আছে; ফলে ঢাকার শিশুরা অথবা

কোন একটি গ্রামের শিশুরা এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম নয় অর্থাৎ ঢাকা অথবা একটা গ্রাম থেকে তথ্য নিয়ে পোলিও এবং হামের টীকা নিয়েছে এমন শিশুদের জন্য যে আনুপাতিক হার পাওয়া যাবে তা বাংলাদেশের জন্য হার বলে গ্রহণ করা যাবে না; কারণ বিভিন্ন কারণে ঢাকায় এরূপ শিশুদের আনুপাতিক হার খুব বেশী হবে এবং একটি গ্রামে তা খুব কম হবে। এরূপ ক্ষেত্রে সমষ্টির প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা বাছাই করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা বাছাই করার পদ্ধতিগুলো[৫] হল সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন (simple random sampling), নিয়ম ক্রমিক নমুনায়ন (systematic sampling), স্তরিত দৈবচয়ন নমুনায়ন (stratified random sampling) গুচ্ছ নমুনায়ন (cluster sampling), বহু পর্যায় নমুনায়ন (multistage sampling), স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (purposive sampling), প্রভৃতি যা সম্বন্ধে পরবর্তীতে জানা সম্ভব হবে।

প্রখ্যাত নমুনা বিশারদ লেসলি কিশ একটি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা নির্বাচনের জন্য চারটি নির্ণায়ক[৬] নির্ধারণ করেছেন। এগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) *লক্ষ্য নির্ধারণ :* নমুনায়নের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নমুনা নির্বাচন ও নিরূপণ এমনভাবে করতে হবে যেন তা বাস্তব অবস্থার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

(খ) *পরিমাপকতা :* নমুনা রূপরেখা (sample design) এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যেন তা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পরিমাপ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ধারণা দিতে পারে। তদুপরি সমষ্টি থেকে নমুনায়নের মাধ্যমে অর্জিত পরিমাপের বিচ্যুতির পরিমাণ যাতে নমুনা থেকে পাওয়া যায় সেরূপ ব্যবস্থা নমুনা রূপ–রেখায় উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

(গ) *বাস্তবতা :* নমুনা–রূপরেখা যদি শুধু তত্ত্বীয় ধ্যান–ধারণা প্রসূত হয় তাহলে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। তাই নমুনা–রূপরেখা অবশ্যই বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে।

(ঘ) *আর্থিক অবস্থা :* স্বল্পতম ব্যয়ে যাতে জরিপের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা যায় নমুনা–রূপরেখায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সার্বিক ব্যয়কে স্থির রেখে যেমন সবচেয়ে বেশী নির্ভুলতা (precision) অর্জনের কথা চিন্তা করা যায় তেমনি নির্ভুলতার মাত্রা স্থির রেখে সবচেয়ে কম অর্থ ব্যয়ে জরিপের লক্ষ্যে পৌঁছানোর রূপ–রেখাও দেয়া সম্ভব।

জরিপ এবং অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল কতজন লোকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে নমুনার আকার (sample size) অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতির (যেমন সাক্ষাতকার, পরীক্ষামূলক ও পর্যবেক্ষণ মূলক) নমুনার আকার থেকে বড় হয়ে থাকে, কারণ জরিপ গবেষণায় নমুনা সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। যেমন ১৯৮৯ সনের বাংলাদেশের প্রজননী জরিপে (Bangladesh Fertility Survey,

1989) নমুনার আকার ছিল ১২০০০ সক্ষম মহিলা। অধ্যাপক তাহেরুল ইসলাম, ডঃ শামসুদ্দিন আহমদ ও অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী মিঞার ১৯৯০ সনের শিল্পসুমারীতে নমুনার সংখ্যা (শিল্প প্রতিষ্ঠানের) ১০৫০ এর বেশী। কেউ কেউ বলেন সাধারণত জরিপে কোন বিষয়ে দেশের প্রতিনিধিত্বকারী নমুনার আকার ১৫০০–এর বেশী হয়ে থাকে। তাদের সাথে আমি একমত নই; কারণ সময়, ব্যয়ের পরিমাণ, নির্ভুলতার পরিমাণ, নমুনায়ন পদ্ধতি প্রভৃতি বিবেচনা করেই প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়নের আকার নির্ধারণ করা হয়।

নমুনার আকার ও ধরণ ঠিক হলে জরিপ পরিচালনা করার আগে আরও কতগুলি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেমন, জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহে কি ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রয়োজন? এতে কত সময় ও কত টাকা লাগবে? লোকজনের সাথে কি টেলিফোনে বা ডাকে যোগাযোগ করা যায়? গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো কি একটি জরিপেই অর্জন করা সম্ভব, না বিভিন্ন সময়ে একাধিক জরিপের প্রযোজন? জরিপের প্রশ্নমালা প্রণয়নের আগে উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

জরিপ গবেষণা পরিচালনায় পর্যায়ক্রমে কয়েকটি প্রধান প্রধান ধাপ আছে। এ ধাপগুলো হচ্ছেঃ (ক) জরিপের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা ও অনুমান গঠন করা; (খ) কিভাবে এবং কি কি উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া; (গ) প্রশ্নমালা প্রণয়ন; (ঘ) কি ধরনের নমুনায়ন ব্যবহৃত হবে তা নির্ধারণ করা; (ঙ) জরিপের কাজ সুচারুরূপে সংগঠিত করার জন্য কাজ আরম্ভ করার আগেই সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং (চ) উপাত্তকে সঠিকভাবে সাজানো, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি। এ বিষয়ে বিশদভাবে পরবর্তীতে জানা যাবে।

অন্যান্য গবেষণার ন্যায় জরিপ গবেষণায়ও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। জরিপ গবেষণার প্রধান সীমাবদ্ধতা হল যে, যারা প্রশ্নের জবাব দেবেন তাদের উপর তার সাফল্য নির্ভর করছে; কারণ তাদের স্মৃতিশক্তি, আগ্রহ, বিষয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান, তাদের সততা ও খোলা মনের উপর নির্ভর করছে তথ্য কত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হবে তবে প্রশ্নমালায় প্রশ্নের শব্দচয়ন, প্রশ্নগুলোর ধারাবাহিকতা (sequence) এবং কত সুন্দরভাবে প্রশ্ন উপস্থাপিত হয় তার উপরও জরিপ গবেষণার সফলতা নির্ভরশীল।

নিবিড় সাক্ষাতগ্রহণ গবেষণা
(Intensive Interviewing Research)

জরিপ গবেষণায় প্রশ্নমালার মাধ্যমে যে সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয় তাতে সাক্ষাতকার গ্রহণকারী প্রশ্ন করতে থাকেন এবং সাক্ষাতকার প্রদানকারী প্রশ্নের জবাব প্রদান করতে থাকেন। এমন অনেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আছেন যারা কোন কোন স্পর্শকাতর (sensitive) বিষয়ে কথা বলতে চান না বা কোন প্রকার জবাব দিতেও চান না – যেমন

যেমন মহিলারা তাদের সতীত্ব (chastity) সম্বন্ধে আলাপ করতে চান না; বাংলাদেশের গ্রামের মহিলারা যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিশেষ করে বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তারা এ বিষয়ে বিশেষ আলাপ থেকে বিরত থাকতে চান। এমতাবস্থায় এ সকল ব্যক্তির অথবা এ সকল ব্যক্তির মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে *স্কিপার* এবং *ম্যাকাফী* 'নিবিড় সাক্ষাত গ্রহণ পদ্ধতি' নামে একটি পদ্ধতি[১০] উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতিতে গবেণার বিষয়ে কোন ব্যক্তির গভীরভাবে সাক্ষাত গ্রহণ করা হয় তবে এ সাক্ষাতগ্রহণ খুব দীর্ঘ হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিকবারও হয়ে থাকে। গবেষক ও সাক্ষাত প্রদানকারীর মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে তোলার উপর, একে অপরের প্রতি বিশ্বাসভাজন হওয়ার উপর এ সাক্ষাতকারের সাফল্য নির্ভর করে। এ সাক্ষাতকারে কাঠামোযুক্ত (structured) প্রশ্ন থাকে না তবে গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত চেক-লিষ্ট বা 'গাইড লাইন' থাকে। সাক্ষাত প্রদানকারীর মর্জি মাফিক প্রশ্ন করতে হয়। কোন প্রশ্নে যদি সাক্ষাৎ প্রদানকারী বিরক্ত হন তবে এ প্রশ্ন ছেড়ে যা কম স্পর্শকাতর এরূপ প্রশ্নে চলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশে বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতির উপর গবেষণায় কখন, কেন, কি অবস্থায় একজন মহিলা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা জানার জন্য বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণকারী মহিলাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ডঃ শামসুদ্দিন আহমদ ও জনাব নাজমুল হক "নিবিড় সাক্ষাৎ গ্রহণ" পদতি ব্যবহার করেছেন। [১১]

অন্যান্য সাক্ষাত গ্রহণ পদ্ধতি থেকে নিবিড় সাক্ষাত গ্রহণ পদ্ধতি আলাদা এদিক দিয়ে যে সাক্ষাত গ্রহণকারী ইচ্ছা করলে প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করতে পারেন যাতে সাক্ষাত প্রদানকারীর মনে আঘাত না লাগে, প্রশ্ন ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন যদি সাক্ষাৎ প্রদানকারী তা বুঝতে না পারেন। এ রকম সুযোগ কাঠামোযুক্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাত গ্রহনকালে সাক্ষাত গ্রহণকারীর থাকে না। নিবিড় সাক্ষাত গ্রহণ পদ্ধতিতে "সাক্ষাতগ্রহণ" বা 'কথোপকথনই" হল তথ্য সংগ্রহের কৌশল (tool) কিন্তু জরিপ গবেষণায় "প্রশ্নমালা" হল তথ্য সংগ্রহের যন্ত্র (instrument) যার সাহায্যে সাক্ষাতগ্রহণ ছাড়াও ডাক মারফত বা অন্যকোন উপায়ে প্রশ্নমালা পুরণ করা যায়। সর্বোপরি নিবিড় সাক্ষাত গ্রহণ পদ্ধতি হল সাক্ষাত প্রদানকারী ও সাক্ষাতগ্রহণকারীর মধ্যে কথোপকথন (interaction); এ কথোপকথন যতক্ষণ শান্ত পরিবেশে চালানো যায় ততক্ষণ ভালভাবে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। কোন প্রশ্নে সাক্ষাতকার প্রদানকারী মানসিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হলে কথোপকথন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

নিবিড় সাক্ষাত গ্রহণ গবেষণায় গবেষণার উদ্দেশ্য, তথ্য সংগ্রহের জন্য বিকল্প প্রশ্ন বা কথোপকথনের চেক-লিষ্ট তৈরী, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ প্রভৃতি গবেষণার পর্যায়গুলো রয়েছে। এ পদ্ধতিতে গবেষণার প্রধান সুবিধা হল কথোপকথন চলাকালে সাক্ষাতগ্রহণকারী (গবেষক) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ একসাথে করতে পারেন যার ফলে কথোপকথন চলাকালে গবেষক অনুমান (hypothesis) তৈরী করেন এবং তা তথ্যের

মাধ্যমে যাচাই করতে পারেন। এ পদ্ধতিতে গবেষণার প্রধান অসুবিধা হল, তথ্য বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না; ফলে পরিসংখ্যানগত সিদ্ধান্ত (statistical inference) সম্ভব নয়। সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই এ সকল গবেষণায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা
(Observational Field Research)

পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় অনুমিত শর্ত (assumption) হল যে স্বাভাবিক পরিবেশে লোকজনকে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা তাদের উদ্দেশ্য, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হব। এ গবেষণা পরিচালনা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন ধাপ (steps) নেই। গবেষণার সমস্যা সুনির্দিষ্ট করণ, তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণে প্রচুর বিভিন্নতা রয়েছে। তবে গবেষণার উদ্দেশ্য, কাদের পর্যবেক্ষণ করা হবে; কি কি দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা হবে–এসব বিষয়ে গবেষকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে

বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রয়েছে। এ কর্মসূচীতে সক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির মধ্যে, বন্ধ্যাকরণ, কপার–টি, আইইউডি, এবং ইনজেকশনকে ক্লিনিকেল পদ্ধতি বলা হয়। নিয়ম অনুযায়ী উপজেলা হাসপাতাল ও ইউনিয়নে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে এ সকল ক্লিনিকেল পদ্ধতি প্রদান করা হয়। কোন সক্ষম মহিলা যখন ক্লিনিকেল পদ্ধতি গ্রহণ করতে হাসপাতাল বা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসেন, তখন তাকে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরামর্শদানের (counselling) প্রয়োজন আছেঃ কোন পদ্ধতির কি কি সুবিধা ও অসুবিধা; কোন পদ্ধতির কি কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া; কোন পদ্ধতির কি কি কন্ট্রাইন্ডিকেসন্‌স (contraindications) যা থাকলে পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না; ন্যূনতম পক্ষে কয়টি ছেলে–মেয়ে থাকা উচিৎ, ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে ঠিকমত পরামর্শ প্রদান করা হয় কি না তা সরকার জানতে চান। কোন গবেষক যদি জরিপ গবেষণার মাধ্যমে যারা সেবা প্রদান করেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তারা ঠিকমত পরামর্শ দান করেন কি না তখন নিশ্চয়ই ইতিবাচক উত্তর আসবে; আবার যখন যারা ক্লিনিকেল পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এমন সক্ষম মহিলাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, ক্লিনিকেল পদ্ধতি গ্রহণের সময় তাদেরকে কি কি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে, তখন হয়তো ধরা পড়বে যে ঠিকমত পরামর্শ প্রদান করা হয় নাই; কারণ এতদিন পরে তারা ঠিকমত সব পরামর্শ স্মরণ রাখতে পারবে না। এমতাবস্থায়, সেবা প্রদানকারীগণ প্রকৃতপক্ষে কতটুকু পরামর্শ দান করে থাকেন তা জানার জন্য পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা চালানো যেতে পারে। এ ধরনের গবেষণায় একজন তথ্য সংগ্রহকারী উপজেলা হাসপাতালে অথবা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে যেখানে ক্লিনিকেল পদ্ধতির সেবা প্রদান করা হয় সেখানে উপস্থিত থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে

শুধু দেখবেন ঠিকমত পরামর্শ প্রদান করা হয় কি না। এ পদ্ধতিতে[১২] 'নিপোর্টে' একটি গবেষণা চালানো হয়েছে।

পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহকারীর চার ধরনের ভূমিকা[১৩] হতে পারেঃ (ক) সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষক (complete observer); (খ) পর্যবেক্ষক–অংশগ্রহণকারী (observer-as-participant); (গ) অংশগ্রহণকারী–পর্যবেক্ষক (participant-as-observer) এবং (ঘ) সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী (complete participant)। সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষক ও সম্পূর্ণ অংশ–গ্রহণকারী ছদ্মবেশে থাকেন যাতে যাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তারা পর্যবেক্ষক যে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন সে সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না। সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষক পুরোপুরিভাবে নীরব থাকে; সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী যাদের পর্যবেক্ষণ করা হয় তাদের সাথে মিশে যায় যাতে তারা তাকে নিজেদের মতই একজন বলে মনে করে। অংশগ্রহণকারী–পর্যবেক্ষক যাদের পর্যবেক্ষকণ করা হয় তাদের সাথে মিশে যেতে চেষ্টা করে এবং পর্যবেক্ষকের ভূমিকা লুকায়ে রাখতে চায়। আর পর্যবেক্ষক–অংশগ্রহণকারীর মধ্যে পর্যবেক্ষকের ভূমিকাই প্রাধান্য পায়; তারা যাদের পর্যবেক্ষণ করা হয় তাদের সাথে মিশতে চেষ্টা করে না, তারা পর্যবেক্ষকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে যায় বা অবগত থাকে। তথ্য সংগ্রহকারীরা এ চারটির কোন ভূমিকা পালন করবেন তা নির্ভর করে সেখানকার অবস্থার ও কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে চান তার উপর।

পর্যবেক্ষকের সাফল্য নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের সে কতটুকু সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে নোট রাখতে পারে। পর্যবেক্ষণ এর উপর নোট যে পর্যবেক্ষণের সময় রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই; বরং পর্যবেক্ষণ শেষে বাসায় ফিরেও নোট রাখতে পারে। এ নোটে যতটুকু সম্ভব বিশদভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা থাকা উচিৎ। তথ্য সংগ্রহের পর মাঠ থেকে ফিরে পর্যবেক্ষককে তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়।

পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার প্রধান অসুবিধা হল সংগৃহীত তথ্যে গবেষকের/তথ্য সংগ্রহকারীর বায়াস (bias) উপস্থিত থাকতে পারে, ফলে এ পদ্ধতিতে তথ্য খুব বেশী নির্ভরযোগ্য বলে আশা করা যায় না। এজন্যই পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা জরিপ গবেষণার পরিবর্তক (substitute) হিসাবে ব্যবহৃত হয় না বরং পরিপুরক (complementary) হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পরীক্ষামূলক গবেষণা
(Experimental Research)

পরীক্ষামূলক গবেষণাতে অত্যধিক নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় এক বা একাধিক স্বাধীন বা প্রভাব বিস্তারকারী (independent) চলকের সাথে একটি নির্ভরশীল বা প্রভাবান্বিত (dependent) চলকের নিগূঢ় সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য পরীক্ষা চালনা করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কার্য–কারন (cause effect) সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পরীক্ষা চালানো হয় এবং

কারণ (cause) সম্পর্কিত অনুমান (hypothesis) যাচাই করা হয়। এ গবেষণায়ও গবেষণার উদ্দেশ্য, অনুমান গঠন বা নমুনায়ন, তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহকারী নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার পর্যায়গুলো সমভাবে প্রযোজ্য।

দুটি ঘটনার মধ্যে যে ঘটনাটি আগে ঘটে তাকে কারণ এবং যে ঘটনাটি পরে ঘটে তাকে কাজ বা ফল (effect) বলা হয়। তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আগে যা ঘটে তাকে সন্দেহাতীতভাবে পরবর্তী ঘটনার কারণ বলে অনেক সময় অভিহিত করা যায় না। যেমন একজন গায়ক গান গাওয়ার পর একজন লোকের মৃত্যু হল; এখানে গান গাওয়াকে মৃত্যুর কারণ বলে ধরে নেয়া ঠিক হবে না। তা'ছাড়া সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় দুটো ঘটনাই অনেক সময় একই সাথে কারণ অথবা কাজ/ফল হতে পারে; যেমন – একজন শিক্ষকের পদমর্যাদা (rank) যত উঁচু হবে তার জ্ঞানের পরিধিও বেশি হবে; আবার উল্টোভাবে, একজন শিক্ষকের জ্ঞানের পরিধি বেশী হলে তার পদমর্যাদাও উঁচু হবে; এক্ষেত্রে কোনটা কারণ ও কোনটা ফল/কাজ তা বলা কষ্টকর।

পরীক্ষামূলক গবেষণায় যাদের উপর পরীক্ষা চালানো হবে তাদের কমপক্ষে দুটি গ্রুপে ভাগ করতে হবেঃ একটি পরীক্ষামূলক অপরটি নিয়ন্ত্রিত (controlled); পরীক্ষামূলক গ্রুপটিতে পরীক্ষা চালানো হয় এবং নিয়ন্ত্রিত গ্রুপে কোন পরীক্ষা চালানো হয় না এবং তা পরীক্ষামূলক গ্রুপের সাথে তুলনা করার জন্য রাখা হয়। তবে এটা গবেষককে নিশ্চিত হতে হবে যে দুটি গ্রুপই মোটামোটি সবদিক দিয়ে সমজাতীয়। দুটি গ্রুপের মধ্যে সমজাতীয়তা আনয়ন করা যায় দুটি পন্থায়ঃ (ক) দৈব চয়িত নমুনায়ন পদ্ধতি এবং (খ) নির্বাচিত কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা চলক অনুযায়ী দুটি গ্রুপকে সদৃশ্য বা সমকক্ষ (match) করে। দুটি গ্রুপকে সমজাতীয় করতে হলে দুটি পন্থা একসাথে ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বয়স অনুযায়ী দুই গ্রুপের লোকজনকে কিভাবে সমজাতীয় করা যায়; দুই গ্রুপে লোকজন দৈব–চিয়ত নমুনায়ন পন্থায় এমনভাবে বাছাই করতে হবে যাতে দুই গ্রুপের গড় বয়স মোটামোটি সমান হয়।

পরীক্ষামূলক গবেষণার চার প্রকারের[১৪] নকশা (design) আছেঃ

(ক) শুধুমাত্র পরে (after-only)

(খ) আগে–পরে (before and after)

(গ) প্রকৃতপক্ষে পরে (ex-post facto)

(ঘ) প্যানেল স্টাডি (panel study)

(ক) ***"শুধুমাত্র পরে" পরীক্ষামূলক নকশা ঃ*** এ নকশায় পরীক্ষামূলক গ্রুপ ও নিয়ন্ত্রিত গ্রুপ একে অপরে সদৃশ্য; দুটি গ্রুপই অনিয়ন্ত্রিত বাহ্যিক কারণগুলো (factors) দ্বারা সমভাবে প্রভাবিত। পরীক্ষামূলক গ্রুপ কারণ চলক (causal variable) দ্বারা প্রভাবিত হবে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত গ্রুপ তা' দ্বারা প্রভাবিত হবে না। পরীক্ষা শেষ হলে, দুই

গ্রুপের উপর কারণ–চলকের প্রভাব তুলনা করা হয়; এতে দেখা যায় যে পরীক্ষামূলক গ্রুপের উপর কারণ–চলকের প্রভাব (Y) আছে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত গ্রুপের উপর কারণ–চলকের কোন প্রভাব নাই। ফলে কারণ–চলককে (X) *কারণ* এবং Yকে *প্রভাব* হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ডঃ শামসুদ্দিন আহমদ এ ধরনের গবেষণা নকশা ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, সেচের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি একর জমিতে গমের উৎপাদন বেশী হয়, সেচের পানি ব্যবহার করা হয় না এমন এক একর জমির তুলনায়।[১৫] এখানে কারণ–চলক হল সেচের পানি এবং প্রভাব হল গমের উৎপাদন; পরীক্ষামূলক এক একর গমের জমিতে সেচের পানি দেয়া হয়েছে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত এক একর গমের জমিতে সেচের পানি ব্যবহার করা হয় নাই।

এই পরীক্ষামূলক নকশার দুটি সীমাবদ্ধতা আছেঃ (ক) দু'টি গ্রুপ পুরোপুরি সদৃশ্য তা ধরে নেয়া স্বভাবত সত্য নয় এবং তা করাও গবেষকের পক্ষে কঠিন কাজ, এবং (খ) এটাও সম্ভব যে কিছু বাহ্যিক কারণ অথবা কারণ–চলক (X) এবং কিছু বাহ্যিক কারণ একসাথে প্রভাব (Y) সৃষ্টি করেছে; ফলশ্রুতিতে X –কে Y–এর কারণ হিসাবে বিবেচনা করা ঠিক নয়।

(খ) *আগে – পরে পরীক্ষামূলক নকশা :* এ নকশায় পরীক্ষমূলক গ্রুপ একটা থাকবে; নিয়ন্ত্রিত গ্রুপ এক বা একাধিক হতে পারে। গ্রুপগুলো এমনভাবে নেয়া হয় যাতে পরীক্ষার আগে সকল গ্রুপের প্রভাব সমান হয়; সকল গ্রুপই অনিয়ন্ত্রিত কারণগুলো দ্বারা সমানভাবে প্রভাবিত হয় বলে ধরা হয়; কেবল মাত্র কারণ চলক (X) পরীক্ষামূলক গ্রুপকে প্রভাবিত করে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত গ্রুপকে প্রভাবিত করে না। আগে–পরে পরীক্ষামূলক নকশায় প্রভাব (Y) পরীক্ষার আগে ও পরে পরিমাপ করা হয়; পরীক্ষার আগে ও পরে পরিমাপ করে প্রাপ্ত প্রভাবের পার্থক্যই হল কারণ–চলকের প্রভাব।

আগে–পরে পরীক্ষামূলক নকশারও সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমত, পরীক্ষার আগে পরিমাপে সকল গ্রুপের প্রভাব (Y) সমান এমন সব গ্রুপ পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে অনিয়ন্ত্রিত কারণগুলো দ্বারা সকল গ্রুপই সমানভাবে প্রভাবিত হবে তাও নিশ্চিত বলা যায় না; একটি গ্রুপ যেভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা অন্য গ্রুপের প্রভাব থেকে ভিন্ন হতে পারে। যা হোক এ নকশায় গবেষণার ফলাফল 'শুধুমাত্র–পরে' নকশার চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য।

(গ) ***প্রকৃতপক্ষে পরে পরীক্ষামূলক নকশা :*** অনেক সময় যে জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা চালানো হবে সে জনগোষ্ঠীকে দুটি সদৃশ্য গ্রুপে ভাগ করা সম্ভব নয়; এমতাবস্থায় 'প্রকৃত–পক্ষে পরে' নকশা ব্যবহার করা হয়। যেমন, কোন গবেষক কোন একটি দেশে সংগঠিত বিপ্লবের কারণ কি তা গবেষণার মাধ্যমে জানতে চান; এক্ষেত্রে

বিপ্লব সংগঠিত হওযার আগে সে দেশে কি অবস্থা বিরাজ করছিল তা বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় গবেষক দুইটি দেশ এমনভাবে নির্বাচন করবেন যেন একটি দেশে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে এবং অন্য দেশটিতে বিপ্লব সংগঠিত হয় নাই অথচ অন্যান্য দিক দিযে দু'টি দেশই একটি অপরটির সদৃশ্য। দুই দেশে বিরাজমান অবস্থার তুলনা করে গবেষক বিপ্লবের কারণসমূহ আবিষ্কার করতে পারবেন। গবেষণার এ নাকশায় বর্তমানের মাধ্যমে অতীত সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করা হয়। সেজন্য এই পরীক্ষামূলক নকশাকে 'প্রকৃতপক্ষে পরে' নকশা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এ নকশার প্রধান সীমাবদ্ধতা হল সবদিক দিয়ে দুটি সদৃশ্য দেশ বা গ্রুপ মিলানো বেশ কঠিন। দুটি দেশ বা গ্রুপ সদৃশ্য হিসাবে বিবেচনা করার *বস্তুনিষ্ঠ মাপকাঠি* নির্ণয় করাও বেশ কষ্টকর।

(ঘ) ***প্যানেল স্টাডি ঃ*** অধিকাংশ গবেষণায় একটি বিষয়বস্তু/সমস্যার উপর কোন একটি জনগোষ্ঠী থেকে একবারই সাক্ষাতকারের মাধ্যমে অথবা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ জাতীয় গবেষণায় বিষয়বস্তু বা সমস্যা সময়ব্যাপী কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তার চিত্র পাওয়া যায় না। কোন বিষয়বস্তু/সমস্যার ধারা/গতি সময়ের সাথে সাথে কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তার জন্য প্যানেল ষ্টডি করা হয়। গবেষণার বিষয়বস্তু/সমস্যার উপর যাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয় এবং তাদের তালিকাকেই 'প্যানেল' বলা হয়। তাদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময় পরপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মনে করি X হল কারণ–চলক এবং এ কারণ–চলক (x) প্যানেলের লোকজনের উপর প্রভাব (Y) সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে (X) যদি Y এর কারণ হয়ে থাকে তবে সময়ের সাথে সাথে প্রভাব (Y) পুঞ্জিভূতভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর প্যানেলের লোকদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে তা প্রতিভাত হবে। X যদি Y এর কারণ না হয় তবে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে Y বৃদ্ধি পাবে না।

প্যানেল স্টাডির একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে *স্টাউফার* আমেরিকান আর্মীদের মূল্যবোধ–সিষ্টেম গ্রহণ ও তাদের প্রমোশনের মধ্যে প্যানেল স্টাডির মাধ্যমে সম্পক[১৬] বের করেছেন। তিনি যারা আমেরিকান আর্মীতে প্রথম যোগদান করেছেন তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গঠিত "মূল্যবোধ" নির্দেশক অনুযায়ী তাদেরকে ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন। এর চার মাস পরে আবার সাক্ষাত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের "মূল্যবোধ" নির্দেশক অনুযায়ী তাদেরকে আবার ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন। তিনি দেখতে পান যে, যারা "মূল্যবোধ" তালিকায় উপরের দিকে আছেন তারাই উচ্চপদে প্রমোশন পেয়েছেন। তাতে প্রমাণ হল যে যারা আমেরিকান আর্মীর মূল্যবোধ–সিষ্টেমকে গ্রহণ করতে পেরেছেন তাদেরেই উচ্চপদে প্রমোশন হয়েছে। এখানে প্রমোশন হল প্রভাব (Y) এবং "মূল্যবোধ গ্রহণ" হল কারণ (X)। সময়ের সাথে সাথে যাদের "মূল্যবোধ" বৃদ্ধি পেয়েছে তারাই উচ্চ পদে প্রমোশন পেয়েছে।

অন্যান্য পরীক্ষামূলক নকশার মত প্যানেল স্টাডিরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, সময়ের সাথে সাথে যাদের প্যানেল তৈরী করা হয়েছে, মৃত্যু, অসুস্থতা, বাসস্থান পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে তাদের সংখ্যা কমে যেতে পারে; ফলে নমুনায়ন শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধিত্বমূল নাও থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, যাদের নাম প্যানেলে আছে, প্রথম সাক্ষাতকার দেওয়ার পর পরবর্তী সাক্ষাতকারে তারা সতর্ক হয়ে যাবেন যাতে পূর্ববর্তী সাক্ষাতের তথ্যের সাথে পরবর্তী সাক্ষাতের তথ্য অসামঞ্জস্য না হয়; ফলে তাদের আচরণে কম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। এমতাবস্থায় প্যানেল স্টাডিতে গবেষণার ফলাফল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে তা বলা ঠিক হবে না।

এতক্ষণ আমরা পরীক্ষামূলক গবেষণা সম্বন্ধে আলাপ করলাম। এ গবেষণার প্রথম অসুবিধা হল সকল দিক দিয়ে সদৃশ্য পরীক্ষামূলক গ্রুপ এবং নিয়ন্ত্রিত গ্রুপ খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। পক্ষান্তরে ফলপ্রসু পরীক্ষা তখনই সম্ভব যখন কার্য–কারণ সম্পর্ক নির্ণয় পদ্ধতি গবেষকের নিয়ন্ত্রণে থাকে – যেমন লেবরেটরীর নিয়ন্ত্রিত অবস্থার পরীক্ষামূলক গবেষণার কথা বলা যায়। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা অত্যন্ত দূরূহ ব্যাপার; কারণ মানব সমাজের প্রত্যেকটি ঘটনা বহুবিধ কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, যার উপর গবেষকের বস্তুত কোন নিয়ন্ত্রণ নাই বলা চলে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণমূলক গবেষণা
(Historical Analysis Research)

ইতিহাস সৃষ্টি হয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। পরিবেশ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকলে ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্য বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। যেহেতু পরিবেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেহেতু এসব বিষয়ে গবেষকের জ্ঞান থাকা দরকার। আবার ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সমাজকে পর্যবেক্ষণ করার মত গবেষকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন; গবেষকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি থাকলেই কেবল অতীত ও বর্তমান ঘটনার সাথে তাদের সংঘটিত হওয়ার কারণগুলোর সম্পর্ক খুঁজে বের করা সম্ভব; আরও সম্ভব হবে ঘটনার সাথে পরিবেশের সম্পর্ক বের করা।

বর্তমানে যে ঘটনা ঘটছে তা অতীত থেকে নিরবচ্ছিন্ন নয়; অতীতে সংঘটিত কতগুলো ঘটনা ঘটার কারণেই বর্তমানে ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। তাই বর্তমান ঘটনাকে বুঝতে হলে, বিশ্লেষণ করতে হলে অতীতে সংঘটিত সত্য ও তথ্যের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অতএব অতীতের অর্থাৎ ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যের মাধ্যমে বর্তমানের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণকে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণমূলক গবেষণা বলা হয়। পি· ভি· ইয়ং এর মতো "ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি হল অতীতের ঘটনাপ্রবাহ এবং সামাজিক শক্তিসমূহের (যা বর্তমানকে রূপদান করেছে) উপর গবেষণা করে তত্ত্ব উদ্ভাবন করা"। [১৭] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কার্ল মার্কসের মতে, বর্তমানে আমরা যে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেখছি

তা একদিনে হয় নাই; কারণ সমাজ ও সামাজিক জীবন প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হচ্ছে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে অতীতের উৎপাদন ব্যবস্থা কি ছিল তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে; প্রথমত, আদিম কমিউনিজম থেকে পরিবর্তনের মাধ্যমে দাসত্বপ্রথার উদ্ভব হয়েছিল; দ্বিতীয়ত, দাসত্ব প্রথার পরিবর্তন হয়ে সামন্তবাদের উদ্ভব হয়েছিল; তৃতীয়ত, সামন্তবাদের পরিবর্তন হয়ে বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের এ ধারা কেন এরূপ হয়েছে তা কার্ল মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমানকে বিশ্লেষণ করতে অতীতের ঘটনাবলী ও তাদের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করার যে পদ্ধতি উদ্ভব হল সে পদ্ধতিকেই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি বলতে পারি এবং যে গবেষণায় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণমূলক গবেষণা বলে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণমূলক গবেষনায় সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণার কতিপয় পর্যায় যেমন গবেষণার উদ্দেশ্য, অনুমান গঠন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য বিশ্লেষণ বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে এ গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকারঃ (ক) গবেষণার সমস্যাটি সুনির্দিষ্ট করতে হবে; কারণ যেকোন সমস্যার জন্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না; (খ) উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে; প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উৎস থেকে কি কি উপাত্ত প্রয়োজনীয় তা নির্ণয় করতে হবে; (গ) যে বিষয়ে গবেষণা চালানো হচ্ছে সে বিষয়ের উপর প্রাপ্ত সকল তথ্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করতে হবে; তা না করলে গবেষণা পূর্ণাঙ্গ হবে না; (ঘ) দলিল দস্তাবেজ (documents) কোন ঘটনা সঠিক কি না তা যাচাই করতে এবং সামাজিক ঘটনা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে হারানো যোগসূত্র বের করতে সাহায্য করবে। যে সময়ে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে, দলিল দস্তাবেজগুলা সে সময়ের যত কাছাকাছি হবে ততই বিশ্বাসযোগ্য হবে; তথ্য যতবেশী বিস্তারিত হবে ততবেশী নির্ভরযোগ্য হবে। অফিসিয়াল দলিল দস্তাবেজকে ব্যক্তিগত দলিলদস্তাবেজ থেকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ; ব্যক্তিগত দলিল দস্তাবেজ কোন বিষয় বা ঘটনাকে সমর্থনের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষনমূলক গবেষণায় বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়; বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও সামঞ্জস্যপূর্ণতার যাচাই গবেষককে করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে গবেষকের সতর্কতা, সহনশীলতা, সমবেদনাপূর্ণ কিন্তু পর্যালোচনামূলক দৃষ্টি এ জাতীয় গবেষণায় একান্ত প্রযোজ্যন; তা না হলে এ পদ্ধতিতে গবেষণার প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত নাও হতে পারে।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা
(Content Analysis Research)

সামজিক বিজ্ঞানে যোগাযোগের বিষয়বস্তুর (communication content) উপর অনেকদিন থেকে গবেষণা পরিচালিত হয়ে আসছে। যে যোগাযোগ করছে এবং যার কাছে যোগাযোগ করছে – এ দু–পক্ষের মধ্যেকার যোগাযোগের বিষয়বস্তুর উপর যে ধরনের গবেষণা হয়ে থাকে তাকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা বলা হয়।[১৮]

সমাজে যোগাযোগের প্রাথমিক বাহন (primary modes of communication) হল শব্দ ও ছবি। এ শব্দ ও ছবি বিভিন্নরূপে যোগাযোগের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যেমন – ভাষা, লেখা, শিল্প–কলা, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বই, প্রভৃতি শব্দ ও ছবির বিভিন্ন রূপ। সমাজ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র, জার্নাল, সরকারী রেকর্ডপত্র, ব্যক্তিগত দলিলপত্র যেমন–চিঠি, দিনিলিপি, নভেল, টেপে ধারণকৃত বক্তৃতা, শিশুদের পুস্তক প্রভৃতির মধ্যে লিখিত যোগাযোগের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করেছেন; তারা আরও বিশ্লেষণ করেছেন রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রোগ্রাম। যোগাযোগের রূপ যাহাই হোক না কেন, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা নিম্নলিখিত প্রশ্নের উপর হয়ে থাকেঃ কে কাকে কি বলেছে এবং তার ফল কি? (who says what to whom with what effect ?)। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সূত্র বা কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য, আদর্শ, ইচ্ছা বা মতবাদ সম্পর্কে জানা যায়।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা কি? এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। সাধারণ নির্বাচনের সময় বাংলাদেশে এমন অনেক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে যে সব দলের ম্যানিফেস্টো কি অনেকেই তা জানেন না। একটি রাজনৈতিক দলের ম্যানিফেস্টো সম্পর্কে জানতে হলে, সে দলের নেতৃস্থানীয় লোকের বিভিন্ন দৈনিক খবরের কাগজে যে বিবৃতি ও বক্তৃতা ছাপা হয়ে থাকে তা পড়ে এবং বিচার বিশ্লেষণ করে তা জানা সম্ভব। বিভিন্ন দৈনিক খবরের কাগজে ছাপানো বিবৃতি ও বক্তৃতার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে ঐ রাজনৈতিক দলের ম্যানিফেস্টো সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওযার প্রক্রিয়াকে 'বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা' হিসাবে অভিহিত করা যায়।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা পরিচালনা করার জন্য কতগুলি ধাপ[১৯] আছে যদিও গবেষণার বিষয় অনুযায়ী ধাপগুলি ভিন্নতর হতে পারে। এ গবেষণার প্রধান প্রধান ধাপগুলি হলঃ (ক) গবেষণার বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট করা; (খ) নমুনায়ন করার জন্য আইটেম অর্থাৎ যোগাযোগের উৎস ঠিক করা; (গ) বিশ্লেষণের জন্য কি বিষয় টেবিলের আকারে সাজানো প্রয়োজন তা ঠিক করা; (ঘ) বিশ্লেষণের জন্য বিষয়গুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে কোড নম্বর দেয়া; (ঙ) বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচিত বিষয়গুলো অনেক বেশি হলে কম্পিউটারের সাহায্য নেয়া ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ একটি স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি; এ পদ্ধতিতে কম সময়ের প্রয়োজন হয়; এ পদ্ধতিতে গবেষণায় ব্যয় কম হয়। কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে অথবা দীর্ঘ সময়ের ধারায় এ পদ্ধতিকে ঐতিহাসিক গবেষণায়ও (historical research) ব্যবহার করা সম্ভব। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা সহজ বলে যাদের গবেষণার অভিজ্ঞতা নাই তারাও তা ব্যবহার করতে পারে। এ গবেষণার অসুবিধা হল বিশ্লেষণের জন্য বিষয়গুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজন ও কোডিং অনেক সময় নির্ভরযোগ্য হয় না।

সামষ্টিক উপাত্ত বিশ্লেষণ গবেষণা
(Aggregate Data Analysis Research)

সামাজিক বৈজ্ঞানিকেরা কি কি কারণ (factors) ব্যক্তিগত আচরণকে প্রভাবিত করে এবং কিভাবে সামাজিক পরিবেশে তার আচরণ প্রভাবিত হয় তা বুঝবার চেষ্টা করেন; অর্থাৎ সামাজিক বিজ্ঞানের অনেক গবেষণায় ব্যক্তিকে বিশ্লেষণের একক হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু এটা মনে করা ঠিক নয় যে ব্যক্তিই সামাজিক গবেষণার একমাত্র একক। সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণায় ব্যক্তি ছাড়াও সামাজিক কাঠামোর প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও গতিশীলতা নিয়েও আলোচনা করে; অনেক সময় কোন একটি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তুলনা করা হয়। ফলে সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, জেলখানা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকেও বিশ্লেষণের একক হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। আবার কখনও কখনও সমষ্টিগতভাবে কোন ভূখন্ডের সমুদয় লোকজনের উপর গবেষণা চালানো হয়ে থাকে। এভাবে ব্যক্তিবর্গ থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোন সমাজের বা কোন ভূখন্ডের লোকজনের বৈশিষ্ট্যের উপর যখন আলোকপাত করা হয় তখন একে "সামষ্টিক উপাত্ত বিশ্লেষণ" গবেষণা বলা হয়।

উদাহারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৪৭ সনে যখন হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান হয়েছিল তখন আদমশুমারীতে প্রাপ্ত সমষ্টির তথ্যের উপর ভিত্তি করেই ভারতবর্ষের কোন এলাকা মুসলমান অধ্যুষিত এবং কোন এলাকা হিন্দু অধ্যুষিত তা নির্ণয় করা হয়েছিল। আবার যখন কোন দেশের উন্নয়ন সামাজিক নির্দেশকের (যেমন–দরিদ্রতা, জনগণের নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় তখন প্রকৃতপক্ষে সামষ্টিক উপাত্তই বিশ্লেষণ করা হয়। সামষ্টিক উপাত্ত বিশ্লেষণ গবেষণায় সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার কতিপয় পর্যায় যেমন গবেষণার উদ্দেশ্য, অনুমান গঠন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ প্রভৃতি প্রযোজ্য। এ জাতীয় গবেষণা যেহেতু সামষ্টিক উপাত্তের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু এ গবেষণার তথ্য/উপাত্ত প্রকাশিত বা গৌণ উৎস (secondary source) থেকেই সংগ্রহ করা হয়।

সামষ্টিক উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন[২০] কারণ কোন গোষ্ঠী বা কোন দেশের উপাত্তের উপর ভিত্তি করে যদি সেই গোষ্ঠী বা দেশের একজন ব্যক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যেমন বেশী তেমনি কোন ব্যক্তির উপাত্তের উপর ভিত্তি করে কোন গোষ্ঠী বা দেশের লোকজন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণেও ভুল থাকতে পারে। শেষোক্ত কথাটি প্রযোজ্য হবে যখন নমুনার আকার প্রতিনিধিত্বমূলক না হয়।

তুলনামূলক গবেষণা
(Comparative Research)

সামাজিক বিজ্ঞানে সমাজের কাঠামো ও লোকজনের আচরণ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা একটি সমাজের বা দেশের উপাত্তের বিশ্লেষণ করে নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত অন্য সমাজ বা গোষ্ঠী বা দেশের বেলায় প্রযোজ্য কি না তাও সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণায় যাচাই করা হয়ে থাকে। কোন গবেষণালব্ধ তত্ত্বকে বিভিন্ন সমাজ, গোষ্ঠী বা দেশে সর্বজনীন/ বিশ্বজনীন করার প্রক্রিয়াকে তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত তত্ত্বকে আরও বিস্তৃত করা হয় ও দৃঢ়ভাবে সত্য বলে প্রমাণ করা হয়। একটা তত্ত্বকে বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন করাই এ গবেষণার মূখ্য উদ্দেশ্য।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ডঃ শামসুদ্দিন আহমদ ১৯৬০–৭০ সালের উপাত্ত নিয়ে দেখিয়েছেন [২১] কি করে বৈদেশিক মূলধন বাংলাদেশে বর্ধিত হারে আসার ফলে মোট জাতীয় উৎপাদনে প্রাথমিক সেক্টরের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, শিল্প সেক্টরের অংশ হ্রাস পেয়েছে এবং সেবা সেক্টরের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মূলধনের সাথে মোট জাতীয় উৎপাদনের বিভিন্ন সেক্টরের অংশের এ সম্পর্ক শুধু বাংলাদেশের বেলায় প্রযোজ্য। চেনারী এবং *সিরকুইন* ১৩০টি দেশের ১৯৫০–৬০ সালের উপাত্ত ব্যবহার করে বৈদেশিক মূলধনের সাথে মোট জাতীয় উৎপাদনের বিভিন্ন সেক্টরের অংশের সম্পর্ক বের করেছেন। তার ক্ষেত্রে, বৈদেশিক মূলধন বর্ধিত হারে আসার ফলে মোট জাতীয় আয়ে প্রাথমিক সেক্টরের অংশ হ্রাস পেয়েছে, শিল্প সেক্টরের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেবা সেক্টরের অংশ বৃদ্ধি [২২] পেয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, মোট জাতীয় আয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অংশের সাথে বৈদেশিক মূলধনের যে সম্পর্ক আছে তা' বাংলাদেশে ও অন্যান্য দেশে ভিন্নতর। এভাবে একদেশে উদ্ভাবিত তত্ত্বের বিশ্বজনীনতা অন্যদেশের বা দেশসমূহের উপাত্ত দ্বারা যাচাই করাকে তুলনামূলক গবেষণা বলা হয়।

তুলনামূলক গবেষণায় এক সমাজের বা দেশের তত্ত্ব অন্য সমাজের বা দেশের উপাত্তের দ্বারা যাচাই করা হয়; কি কি বিশেষ কারণে একদেশের তত্ত্ব অন্য দেশে প্রযোজ্য নয় তা আবিষ্কার করা যায়। এভাবে তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রত্যেক তত্ত্বের সর্বজনীনতা থাকবে এমন কোন কথা নাই। সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় যেমন গবেষণার উদ্দেশ্য, অনুমান গঠন, নমুনায়ন, তথ্য

সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন, মাঠকর্মী নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি তুলনামূলক গবেষণায়ও প্রযোজ্য। তুলনামূলক গবেষণায়কিছুঅসুবিধাওআছে।[২৩] প্রথমত, সব দেশে জরিপ পদ্ধতিতে সংগৃহীত উপাত্ত সমজাতীয় হবে না; কারণ এক এক জরিপে একই চলকের সংজ্ঞা দেশ ভেদে ভিন্ন হতে পারে; যারা তথ্য সংগ্রহ করে তাদের অভিজ্ঞতা সব দেশে এক রকম নাও হতে পারে, তথ্য বিশ্লেষণে যে শ্রেণী বিভাগ বা কোডিং করা হয় তা দেশভেদে বিভিন্ন হতে পারে; আবার বিভিন্ন দেশে তথ্য সংগ্রহের জন্য গৃহীত নমুনা বিভিন্ন হতে পারে যার ফলে কোন কোন দেশের তথ্য অন্য দেশের তথ্যের সাথে তুলনীয় নাও হতে পারে; জরিপের পদ্ধতিও দেশভেদে বিভিন্ন হতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রকাশিত তথ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করা হয় বলে সমজাতীয় হয় না। তৃতীয়ত, তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতিতে অনেক সময় সামষ্টিক উপাত্ত (aggregate data) ব্যবহার করা; কিন্তু সামষ্টিক উপাত্ত সরকারীভাবে সংগ্রহ করা হয় বলে নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। এসব কারণে অনেক সময় তুলনামূলক গবেষণা নিষ্ফল হয়ে থাকে।

মূল্যায়নমূলক গবেষণা
(Evaluation Research)

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্নভাবে আমরা মূল্যায়নের কাজ করে থাকি। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বা পরিবেশে এ কাজটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বা আঙ্গিকে করা হয়। যেমন যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিষয়ের উপর মূল্যায়ন, চাকুরীতে নিয়োগের বেলায় চাকুরী প্রার্থীদের মূল্যায়ন, কোন পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন, কোন সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির মূল্যায়ন, ইত্যাদি। যে কোন বিষয় বা কর্মসূচীর সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং তার কারণগুলি জানার জন্য অর্থাৎ এ কর্মসূচীর কার্যকারিতা জানার জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন। বিশেষত যেখানে কোন কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস বা সম্প্রসারণ করা প্রযোজন সেখানে মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক বলে পরিগণিত হয়। নীতি নির্ধারকগণ অনেক সময় জানতে চান, জনসাধারণের মঙ্গলার্থে যে সব সামাজিক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে সে সব কার্যক্রম চাহিদানুযায়ী সেবা প্রদান করতে পারছে কিনা, এ কার্যক্রম কি চালু থাকবে বা এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে বা বন্ধ করে দেয়া হবে – এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হলে অন্যান্য গবেষণার চেয়ে মূল্যায়ন গবেষনার প্রয়োজন সবচেয়েবেশী।

একটি মাপকাঠি সামনে রেখে যখন কোন বিষয় বা কার্যক্রমের প্রকাশিতব্য অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে মূল্যায়নমূলক গবেষণা বলা হয়। এ গবেষণার মাধ্যমে তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাকে। প্রথমত, কোন কার্যক্রমের ফলাফল কি তা জানা যায়। দ্বিতীয়ত, এ কার্যক্রমের অগ্রগতি সময়ান্তরে কতটুকুতে পৌছেছে তা জানা যায়। তৃতীয়ত, এ কার্যক্রমের অগ্রগতির পর্যায় জেনে নীতি

নির্ধারকগণ, পরিকল্পনাবিদ বা পরিকল্পনার বাস্তবায়ক কি করতে হবে তা নির্ধারণ করতে পারেন এবং তদনুযায়ী[২৪] কার্যক্রমকে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, সংকোচন বা বন্ধ করে দিতে পারেন।

উদাহরণ স্বরূপ সাম্প্রতিক কালের সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিগত কয়েক বছর থেকে বাংলাদেশ সরকার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র' স্থাপন করার কাজ হাতে নিয়েছেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল গ্রামে বসবাসকারী মহিলা ও শিশু তথা সমস্ত পরিবারকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা। সরকারের এ উন্নয়ন কর্মকান্ডের দ্বারা আমাদের দেশের জনসাধারণ কতটা উপকৃত হচ্ছে তা যদি জানতে চাই তবে মূল্যায়ন গবেষণার মাধ্যমে এ কার্যক্রমের কার্যকারিতা জানা সম্ভব। মূল্যায়ন গবেষণার মাধ্যমে জানা যাবে, সরকারের পরিকল্পনা কতটা বাস্তব ভিত্তিক? কতজন লোক এ সেবার আওতায় এসেছে? যারা আসেনি তাদের না আসার কারণ কি? গ্রামের জনগণ এ কর্মকান্ডের সংগে নিজেদের কতটুকু সম্পৃক্ত করতে পেরেছে? সম্পৃক্ত করতে না পেরে থাকলে কেন পারেনি? এসকল প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলে ভবিষ্যতে এ কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, বা অন্য পরিবর্তন সম্পর্কে সরকার নীতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন। তবে কার্যক্রমে পরিবর্তন আনয়ন মূল্যায়নমূলক গবেষণার উদ্দেশ্য নয়।

অন্যান্য গাবেষণার ন্যায় মূল্যায়নমূলক গবেষণায়ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য, অনুমান গঠন, নমুনায়ন, তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহকারী নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্য বিশ্লেষণ–এ পর্যায়গুলো রয়েছে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তথ্যের ধারাবাহিকতা, সঠিকতা, সংগৃহীত তথ্যের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বক্তব্য পক্ষপাতযুক্ত না হয়।

এ্যাকশন বা অপারেশনমূলক গবেষণা

এ্যাকশন গবেষণা অনেকটা মূল্যায়ন গবেষণার মত। তবে এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে কার্যক্রম চালু আছে তার মধ্যে পরিবর্তন এনে তাকে আরও সচল ও ফলপ্রসু করে তোলা। এ পারিবর্তন আনা যায় কার্যক্রমের কোন অংশকে বাদ দিয়ে অথবা নতুন কোন অংশ জুড়ে দিয়ে। কার্যক্রমের এ পরিবর্তনকে ব্যয় বহুল না করে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে এর ফলাফল বা লাভ ব্যয়ের তুলনায় যেন বেশী হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়; অর্থনীতির ভাষায় একে cost effectiveness বলা হয়। cost effectivenessকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা যায়, বর্তমানে চালু কার্যক্রমে যে সময় ক্ষেপন, অর্থ, লোক বল ব্যয় করা হয় তার তুলনায় কতটুকু সেবা প্রদান করা গেল বা কতজন লোক এ কার্যক্রমের দ্বারা উপকৃত হল তার বিশ্লেষণ করা। অর্থাৎ অর্থ কার্যক্রমের বাস্তবায়নে যে ব্যয় হল তার ফলাফল কতো বেশী করে জনসাধারণ ভোগ করতে পেরেছে সেটাই এ্যাকশন গবেষণার

প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তাছাড়াও এ্যকশন গাবেষণার কার্যক্রমের সংকোচন বা পরিবর্ধন, বাস্তবায়ন করা কতটুকু সম্ভব তা তলিয়ে দেখা হয়। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায়, স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা অধিদপ্তর দুটোর মাঠ পর্যাযের কর্মসূচীকে একই প্রশাসনিক কাঠামোতে আনার জন্য ১৯৭৬ সনে সুপারিশ করা হয়েছে cost effectiveness মাপকাঠির বিচারে; বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের জন্য তা কার্যকর করার জন্য তখন থেকে চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাঠ পর্যায়ে এ দুটো অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পুরোপুরিভাবে একত্রীকরণ (integration) আজও সম্ভব হয়ে উঠে নাই।

কোন কার্যক্রমের কোন অংশ সংযোজন বা বাতিল করার ফলাফল কি হতে পারে তা জানার জন্য উক্ত সংযোজন বা বাতিল করার পূর্বে ও পরে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অতএব এ্যাকশন গবেষণায় "আগে– পরে পরীক্ষামূলক নকশা" ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন ই· পি· আই· কর্মসূচী প্রবর্তনের পূর্বে এবং পরে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের অবস্থা কোন একটি/একাধিক এলাকায় পরীক্ষা করে দেশব্যাপী ই· পি· আই· কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। প্রথমত, যে এলাকায়/একাধিক এলাকায় ই· পি· আই· কর্মসূচী চালু হয়েছিল তা এ্যাকশন কর্মসূচীর উদাহরণ এবং এ্যাকশন গবেষণার মাধ্যমে তা মূল্যায়ন করেই দেশব্যাপী তা চালু করা হয়েছে। এ্যাকশন গবেষণায় দেখা গেছে ই· পি· আই· কর্মসূচী যেমনি কম ব্যয়বহুল তেমনি এটি সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসু হয়েছে। সামাজিকভাবে সর্বস্তরের লোকের কাছে এটি সহজে গৃহীত হয়েছে। যেহেতু এটি সামাজিকভাবে গৃহীত হয়েছে সেহেতু এটি প্রশাসনিক, দৃষ্টিভঙ্গীতে বাস্তবায়ন সহজ এবং এর মাধ্যমে সরকার স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমকে লোক সমক্ষে আকর্ষণীয় করে তুলতে পেরেছে।

এ্যাকশন গবেষণা ও মূল্যায়ন গবেষণায় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কিছুটা পার্থক্য[২৫] আছে। প্রথমত, কর্মসূচী বাস্তাবায়নের তিনটি পদক্ষেপ হল, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন; আর এ্যাকশন গবেষণা মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে এবং Cost-effectiveness করার জন্য কার্যক্রমের কোন অংশে পরিবর্তন করতে হবে তা নির্ণয় করে। দ্বিতীয়ত, কর্মসূচীর সফলতা বা ব্যর্থতা কতটুকু তা মূল্যায়ন গবেষণার কাজ; কর্মসূচী সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা মূল্যায়ন গবেষণার কাজ নয় কিন্তু একটা কার্যক্রমকে cost-effective করার জন্য কি পরিবর্তন করতে হবে তা হল এ্যাকশন গবেষণার কাজ। তৃতীয়ত, উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে মূল্যায়নকে "সহায়ক" পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু মূল্যায়নের জন্য সংগৃহীত তথ্যগুলোকে এবং মূল্যায়ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকে এ্যাকশন গবেষণায় ব্যবহার করা হয়।

সর্বোপরি, এ্যাকশন গবেষণা ও মূল্যায়ন গবেষণা যেকোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়িত করতে একে অপরের সহায়ক হিসাবে কাজ করে। এ দুটো গবেষণায় কোন তত্ত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে না যদিও এগুলো কোন নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনে সহায়ক হতে পারে।

তথ্য নির্দেশ

১. P.V. Young, *Scientific Social Surveys and Research,* (New Delhi : Prentice Hall 1975), pp. 30-35

২. Johoda Seltiz, Deutsch, and Cook, *Research Methods in Social Relations,* New York : Holt Linehart, 1959)

৩. B. N. Ghosh, *Scientific Method and Social Research,* (New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd., 1982) pp. 181-183

T. S. Wilkinson and P. L. Bhandarkar, *Methodology and Techniques of Social Research,* (Bombay : Himalaya Publishing House,1982), P. 99

৪. *Ibid.* pp. 183-184 and *Ibid.* pp. 99-102.

৫. W. G. Cockran, *Sampling Techniques* (New York : Wiley 1977)

C. Moser, and G. Kalton, *Survey Methods in Social Investigations* (London : Heineman Educational Book, 1979)

D. R. Warwick, and C. A. Lininger, *The Sample Survey : Theory and Practice,* (New York: Mc Graw Hill, 1975)

F. Yales, *Sampling Methods for Censuses and Surveys* (London : Griffin, 1981)

৬. L. Kish, *Survey Sampling* (New York : Wiley 1967)

৭. N. Hoque and J. Cleland, *Bangladesh Fertility Survey 1989,* (Dhaka : NIPORT, 1989)

৮. T. Islam, M. Ali and S. Ahmad, *Bangladesh Surveys of Manufacturing Industries 1990,* (Dhaka: Department of Economics, University of Dhaka, 1991).

৯. J. B. WIlliamson, D.A. Karp, J. R. Dalphin and P. S. Gray, *The Research Craft: An Introduction to social Research Method*, (New York : Little Brown and Company, 1982), pp. 127-157.

১০. J. K. Jr., Skipper Charles and H, McCaghy ``Respondents' Intrusion Upon the Situation : The Problem of Interviewing Subjects with Special Qualities" *The Sociological Quarterly*, Vol. 13, (Spring, 1972) pp. 237-243.

১১. Nazmul Huque and S. Ahmad, *The Study of Compensation Payments and Family Planning in Bangladesh : A Synthesis* (Dhaka : NIPORT, 1989).

১২. Mrs. F. Mabud and M. A. Rashid, *An Assessment of Counselling in the Clinical Contraception in Bangladesh* (Dhaka : NIPORT, 1991).

১৩· G. Raymond, ``Roles in Sociological Field Observation" in G. J. McCall and J. L. Simmons (eds.) *Issues in Participation Observation*, (Massachussetts : Addition-Wesley, 1969).

১৪. Ghosh, *op. cit.* pp. 185-190 and Wilkinson and Bhandarkar, *op-cit*, pp. 102-126.

১৫. S. Ahmad, *Economics of Wheat (HYV/LV) Cultivation Under Irrigated and Non-Irrigated Condition.* (Dhaka : Department of Economics, Dhaka University, 1985).

১৬. S. Stouffer and Associates, *Measurement and Prediction*, (Princeton : New Jersey, 1950).

১৭. P. V. Young, *op. cit.*, p. 207.

১৮. Williamson, et. al. *op. cit.* pp. 239-254.

১৯. *Ibid.* pp. 260-283.

২০. *Ibid.* pp. 204-301.

২১. S. Ahmad, ``Foreign Capital Inflow and Production Structure in Bangladesh" *Bangladesh Economic Studies*, Vol. 5, No. 1, (April 1988).

২২. Chenery H. B. and M. Syrquin, *Patterns of Developments 1950-70* (Oxford University Press, 1975.)

২৩. Williamson et. al. *op. cit.* pp. 306-325.

২৪. NIPORT (1984), *Basic Methods of Evaluative and Action Research* pp. 4-5 and Williamson, et. al. *op. cit.* pp. 330-344.

২৫ NIPORT *op. cit.*, pp. 5-8.